ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৫ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৪২৫

ভারতীয় উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতা: প্রেক্ষিত বাংলা

*ড. মো: ইলিয়াছ উদ্দিন

সারসংক্ষেপ: ১৯৪৭ সালে ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে। নানা আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য দু'টি স্বাধীন সার্বভৌম ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। উপমহাদেশে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, জৈন ইত্যাদি নানা ধর্মের মানুষের বাস। সুদীর্ঘকাল হতে উপমহাদেশের মানুষ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে একে অপরের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করছে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ফলে উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হয় বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হলেও এ দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্বের মতো আর কখনো সম্প্রীতির পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি। মূলত বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে হিন্দু- মুসলিম সম্প্রদায়ের যে সম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়েছিল পরবর্তীতে তা আরও প্রকট আকার ধারণ করে। ফলশ্রুতিতে উপমহাদেশে এ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও কীভাবে তা বিস্তার লাভ করেছিল তা আলোচনা করা হয়েছে।

সাম্প্রদায়িকতা: ইংরেজি (Communalism)[১] শব্দের অর্থ সাম্প্রদায়িকতা। সাম্প্রদায়িক থেকে সাম্প্রদায়িকতা শব্দটি এসেছে।[২] The term came into use in early 20th Century during the British rule, where the rulers saw India divided into several communities and attempted to placate separate communal interest.[৩] সাম্প্রদায়িকতা বলতে একটি জনগোষ্ঠীর নিজ স্বার্থকে তাদের ধর্মীয় দলগুলোর স্বার্থের সাথে অভিন্ন বলে মনে করার প্রবণতা হিসেবে দেখা যায়। এই প্রবণতায় একটি জনগোষ্ঠী অন্য ধর্মীয় গোষ্ঠীর সদস্যদের আচার আচরণ ও মূল্যবোধকে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ও অস্বাভাবিক বলে মনে করা হয়। এ প্রবণতায় ধর্ম রাজনৈতিক আনুগত্য নির্ধারণ করে এবং অতঃপর এই প্রবণতা বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে আন্তঃদলীয় সংঘর্ষের সৃষ্টি করে।[৪] বদরুদ্দীন উমর এর ভাষায়, "কোন ব্যক্তির মনোভাবকে তখনই সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেয়া হয় যখন সে এক বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ভুক্তির ভিত্তিতে অন্য এক ধর্ম সম্প্রদায় এবং তার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধাচরণ এবং ক্ষতি সাধনে প্রস্তুত থাকে"।[৫] এটা ধারণা করা হয় যে, সাম্প্রদায়িক পরিচিতি গঠনের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে বিশেষ ধর্মীয় (বা পবিত্র) প্রতীক জড়িত। যেমন মসজিদের সামনে গান, বাজনা করা, কোরবানি করা বা গো রক্ষা করা, মূর্তি অপবিত্র করা, ধর্মীয় উৎসব পালনের সময় সংঘর্ষ, পবিত্র স্থান ও পবিত্র সময় সম্পর্কিত বিষয়।[৬] এসব বিষয় নিয়ে প্রায়ই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত হয়, তাই এ বিষয়গুলোকে সাম্প্রদায়িক পরিচিতির প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়।

বাংলায় বিভিন্ন ধর্মের আবির্ভাব: সমগ্র উনিশ শতকে ধর্ম সংস্কার আন্দোলন বাঙালি সমাজে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। মানবতা, উদারনৈতিকতা এবং যুক্তিবাদের আলোকে

* সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী

অনেকেই নিজেদের ধর্মকে যাচাই করে নেয়া শুরু করেছিল। বিশ শতকের সমাজ, বিশেষ করে হিন্দু সমাজ, ধর্ম সংস্কারের জন্য অনুকূল ছিল না। কারণ একদিকে জাতীয়তাবাদ তাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে অতীত মুখি করেছিল। অপরদিকে নতুন যুগের শিক্ষা এবং জীবনযাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকেই ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা থেকে ইহলৌকিকতার দিকে সরে গিয়েছিল। ধর্মকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করায় বরং উৎসাহ দেখিয়েছিলেন রাজনীতিকরা। এর প্রকাশ ঘটে কয়েকটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। যেমন- হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগ।[৭]

বাঙালির ধর্মকর্মের ইতিহাস বাঙালি আদিবাসিদের পূজা, আচার, অনুষ্ঠান, ভয়-বিশ্বাস, সংস্কার প্রভৃতির ইতিহাস। বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সংক্রান্ত বিশ্বাস সংস্কার ও আচার অনুষ্ঠান, নানা দেবদেবীর রূপ কল্পনা, আহার, বিহার ইত্যাদি আদিবাসিদের নিকট হতেই গ্রহণ করে।[৮] গুপ্ত আমলে শাসক শ্রেণির সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। তবে গুপ্ত শাসকগণ বৌদ্ধ ধর্মের বিরোধিতা করেছে এমন কোনো প্রমাণ নেই। বাংলায় শশাঙ্কের সময়ে বৈদিক ধর্মের মধ্যে বিশেষ আনুকূল্য লাভ করেছিল শৈবধর্ম। বাংলার বিভিন্ন অংশে একই সঙ্গে বৌদ্ধ সমর্থক ও হিন্দুদের শাসন প্রচলিত ছিল। জৈন ধর্ম বাংলায় প্রাধান্য বিস্তার না করলেও এ ধর্ম বাংলায় এসেছিল এবং অনেক বিহার ও মন্দির নির্মিত হয়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।[৯] পাল রাজারা মহাযানী বৌদ্ধ ধর্মমতের হলেও হিন্দু ধর্মের প্রতি তাদের অশ্রদ্ধা ছিল না। পাল রাজাদের আগে এবং সমকালে খড়্গদেব ও চন্দ্রবংশের রাজারা বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।[১০] সেন আমলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়েছিল। তবে দেশের এক বিরাট জনগোষ্ঠী বৌদ্ধ ধর্ম পালন করতেন। অনেকে মনে করেন যে, হিন্দু সমাজের নিচের তলায় নিম্ন বর্ণের হিন্দু হিসেবে স্থান করে নিয়েছেন। তবে পাল ও সেন আমলের লক্ষণীয় বিষয় হল বৌদ্ধ ধর্ম, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, এবং তন্ত্রমন্ত্র ধর্ম মিলে 'সহজিয়া' সম্প্রদায়ের উদ্ভব। যা সে যুগের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।[১১]

এয়োদশ শতকের শুরুতে মুসলিম সুফি সাধক ও পর্যটকগণ বাংলার অসংখ্য হিন্দু, বৌদ্ধ ও অন্যান্য অমুসলিম সম্প্রদায়কে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছিল। এক্ষেত্রে মুসলিম শাসকগণ কোনো ভূমিকা পালন করেননি। তারা তাদের পূর্বসুরি পাল ও সেন রাজাদের মতো স্থানীয় জনগণকে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রশাসন ও সেনাবাহিনীতে নিয়োগদানের মাধ্যমে দেশ শাসনে অংশীদার করেছিল এবং সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে ভূমিদান করে সহায়তা করেছিল।[১২] মধ্যযুগীয় সুলতানগণ হিন্দুদের ধর্মীয় আচারাদি পালনে বাধা দিতেন না। হিন্দুরা প্রকাশ্যে অথবা মন্দিরে দেব-দেবীর পূজা করতে, পশু বলি দিতে, ধর্মীয় মিছিল করতে, প্রকাশ্যে মঞ্চে কীর্তন করতে পারতো। এছাড়া দেখা যায় যে, হিন্দুরা প্রকাশ্যে শবদাহ কর্ম সম্পন্ন করতো, মদ বিক্রি করতো, শুকর ও কচ্ছপের মাংস খেত।[১৩] হোসেন শাহী বংশের আলাউদ্দিন হোসেন শাহের সময়ে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয়েছিল এবং তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছিলেন। রাজকার্যাদিতে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ এবং তার পুত্র নুসরত শাহ উভয়েই অসাম্প্রদায়িকতার পরিচয় দিয়েছেন।[১৪] সুলতান সুলায়মান কররাণীর সময়ে পুরির মন্দির অপবিত্র করা হয়। এমনকি হিন্দু সমাজের উপর ঘৃণ্যতম অত্যাচার করতে তিনি কুণ্ঠিত হতেন না। অবশ্যই এর কারণ বোধ হয় , যতটা

রাজনৈতিক ততটা সাম্প্রদায়িক নয়।[১৫] শাসকের ধর্ম ইসলাম রাজশক্তির ছত্রছায়ায় প্রচারিত হওয়ার সময়ে সাম্রাজ্যের স্বার্থে অন্য ধর্মাবলম্বীদের দেবালয় ভগ্ন, লোভ ও বল প্রয়োগে ইসলামের আওতায় আনা ও বিধর্মীদের উপর জিজিয়া কর ধার্য করা ইত্যাদি অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। তবে আকবর ও দারাশিকোর মতো মুসলমান শাসক সচেতনভাবে ধর্ম সমন্বয়ের সাধনা করেছিলেন।[১৬] সুলতানী আমলের শাসকদের উদার দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে বাংলায় ইসলাম প্রচারের পাশাপাশি ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ও বৈষ্ণব ধর্মের বিকাশ লক্ষ করা যায়। এ সময়ে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের নিজ নিজ ধর্ম বিশ্বাস ও জীবন পদ্ধতি নিয়ে সম্প্রীতিপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করতেন। এভাবে ইসলাম ও হিন্দু ধর্ম পারস্পরিক সহনশীলতার পরিবেশে একে অপরের সংস্পর্শে আসে।[১৭] মুসলিম শাসকরা বাংলার মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলে স্থানীয় লোকদের ধর্মান্তরিতকরণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ বা তলোয়ারের মাধ্যমে হয়নি। বরং তা হয়েছে সুফি দরবেশদের ধর্ম প্রচারের কারণে।[১৮] ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর মুসলিম অভিজাত শ্রেণি ব্রিটিশ শাসনকে সহজে মেনে নিতে পারেনি। হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য পলাশীর যুদ্ধ ছিল মূলত শাসকের পরিবর্তন। ১৮৫৭ সালে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের দায়ভার পড়ে মুসলমানদের উপর। ফলশ্রুতিতে হিন্দু সম্প্রদায় মুসলিম সম্প্রদায় হতে অগ্রবর্তী অবস্থান গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।[১৯]

সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব

ভারতে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির জন্য ভারতের জনগোষ্ঠীর সাম্প্রদায়িক কাঠামো কিছুটা দায়ী। এই ভূ-খণ্ডের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর জনসংখ্যা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতের প্রায় ৬৫% জনসংখ্যা ছিল হিন্দু ২৫% জনসংখ্যা ছিল মুসলমান এবং ১০% অন্যান্য (বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, শিখ, পার্শি, আদিবাসি ইত্যাদি) ধর্মাবলম্বী। ধর্ম ভিত্তিক জনসংখ্যার বিন্যাসও ভারতের সর্বত্র এক রকম ছিল না। যেমন পূর্ব বাংলায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও পশ্চিম বাংলায় হিন্দুরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। উত্তর ভারতে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও পাঞ্জাবে মুসলমানরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে এসব বিভেদ কাজে লাগান। ব্রিটিশ সরকার ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে প্রতিহত করার জন্য ভারতীয়দের ঐক্যকে নষ্ট করার উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করে।[২০]

সমগ্র উনিশ শতক ধরে ধর্ম সংস্কার আন্দোলন বাঙালি সমাজে একটা বড় জায়গা জুড়ে ছিল। মানবতা, উদারনৈতিকতা এবং যুক্তিবাদের আলোকে অনেকেই নিজেদের ধর্মকে যাচাই করে নিতে চেয়েছিলেন। রাজা রামমোহন রায় এর সূচনা করেন। তাছাড়া দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন এবং রামকৃষ্ণ পরমহংস এতে অবদান রাখেন।[২১] মুসলমানদের মধ্যে ফরায়েজি ও তরিকায়ে মুহম্মাদিয়া আন্দোলন খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। যদিও সে আন্দোলন ছিল ইসলামের মূলে ফিরে যাওয়ার আন্দোলন।[২২] বহিরাগত সংস্কারকরা, বিশেষ করে মুসলমান ওহাবী সংস্কারকরা উপর হতে ইসলামের তত্ত্ব চাপিয়ে দিয়ে সাময়িক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করলেও অন্তিমে তা প্রভাব ফেলতে পারেনি। হিন্দু সংস্কারকরা

মূলত নিজেদের সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন। হিন্দু মুসলমানদের ক্ষেত্রে বাঙালি পরিচয়টা প্রাধান্য পেয়েছে। এ বোধের কারণেই হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিভেদের বদলে বাঙালিত্বের বিভিন্ন উপাদান রক্ষার ব্যাপারে যৌথ লড়াই হয়েছে। এ ধর্মীয় উপাদানগুলোকে সমন্বয়ধর্মী উপাদান বলা যেতে পারে বা অনেকে একে ধর্ম নিরপেক্ষতা বলতে পারে।[২৩] স্থানীয় ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে ইসলামের প্রকৃত আদান প্রদান হয়েছিল। প্রচলিত ইসলাম ধর্মের আচার অনুষ্ঠান লক্ষ্য করার মতো পরিবর্তন বা সমন্বয় হয়। একইভাবে হিন্দু ধর্মের পরিবর্তন ও সমন্বয় হয়েছিল।[২৪] কিন্তু বিশ শতকের সমাজ, বিশেষ করে হিন্দু সমাজ, ধর্ম সংস্কারের জন্য অনুকূলে ছিল না। কারণ একদিকে জাতীয়তাবাদ তাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে অতীতমুখী করেছিল। অপরদিকে নতুন যুগের শিক্ষা এবং জীবনযাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকেই ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা হতে ইহলৌকিকতার দিকে সরে গিয়েছিলেন। ধর্মকে নিজেদের কাজে ব্যবহার করায় বরং উৎসাহ দেখালেন রাজনীতিকরা। এর প্রকাশ বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঘটে। যেমন- মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভা।[২৫] বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সফলতা প্রতিটি প্রদেশে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করে। ১৯০৬ সালের আগে মুসলমানদের কোন সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠন ছিল না।[২৬] ১৮৮৫ সালে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর স্যার সৈয়দ আহমদ কংগ্রেসকে হিন্দু সংগঠন হিসেবে অভিহিত করে তা থেকে মুসলমানদের দূরে থাকার পরামর্শ দেন। তিনি মুসলমানদের মধ্যে পৃথক এবং স্বাধীন জাতির চিন্তার বীজ বপন করেন।[২৭] ১৯০৫ সালে বাংলা প্রদেশকে বিভক্ত করে দু'টি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়। ১. পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ ২. বিহার, উড়িষ্যা ও সম্বলপুর নিয়ে গঠিত হয় বেঙ্গল প্রদেশ। পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের জন্য ১ জন লে. গভর্নর এবং আইন প্রণয়নের জন্য ৫০ সদস্য বিশিষ্ট লেজিসলেটিভ কাউন্সিল অনুরূপভাবে বেঙ্গল প্রদেশের জন্য একজন লে. গভর্নর ও ৫০ সদস্য বিশিষ্ট লেজিসলেটিভ কাউন্সিল গঠিত হয়। প্রথমটির রাজধানী স্থাপিত হয় ঢাকায় এবং দ্বিতীয়টির রাজধানী স্থাপিত হয় কলকাতায়।[২৮] আধুনিককালে সাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টিকোণ হতে বঙ্গভঙ্গের উপর প্রায়ই গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠন, শুরু থেকেই তার বিচ্ছিন্নতার মতাদর্শ এবং ১৯০৭ সালে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা সবই ছিল বঙ্গভঙ্গের রাজনৈতিক স্রোতধারার সৃষ্টি। বঙ্গভঙ্গকে আধুনিক সাম্প্রদায়িকতার ইতিহাসে একটি প্রধান বিভাজক হিসেবে চিহ্নিত করা যায় এবং এমন এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করা যায়, যা ১৯৪৭ সালের বাংলা তথা ভারত বিভাগ অপরিহার্য করে তুলেছিল। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের তাৎক্ষণিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য যে মুসলিম লীগের জন্ম হয়েছির, চূড়ান্ত পর্যায়ে সেই লীগই মুসলমানদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মঞ্চে পরিণত হয়েছিল।[২৯] বাঙালি হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গ রহিতকরণ আন্দোলনকে তীব্র হতে তীব্রতর করে তোলে। উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতা বালগঙ্গাধর তিলক, চরমপন্থী নেতা লালা লাজপাত রায়, মধ্যপন্থী নেতা দাদাভাই নওরোজী, এমনকি উদারপন্থী বলে খ্যাত মনীষী গোখেলও স্বরাজ, স্বদেশী, বিদেশী বর্জন এবং জাতীয় শিক্ষা কর্মসূচি প্রস্তাব সমর্থন করেন। বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডিগ্রি প্রাপ্ত, রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিক তিলকের ভালভাবে জানা ছিল কীভাবে তার অনুসারীদের মধ্যে উগ্র ধর্মীয় চেতনা ও সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলা যায়।

কয়েক বছর আগে থেকে তিনি (Anti-cow Killing society) এর কর্মতৎপরতা প্রসারিত করেন এবং গণপতি উৎসব পালনের উদ্দেশ্যে হিন্দু-মুসলিম রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সম্পর্কিত এক অসাম্প্রদায়িক সংগীত প্রচার করেন।[৩০]

বাংলায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষ বহু পূর্ব থেকেই এখনো কোন কোন ধর্মীয় আচরণ ও অভ্যাস অব্যাহত রেখেছে। যেমন মাজারের প্রতি উভয় সম্প্রদায়ের ভক্তি একই রকমের । বাউল-সহজিয়া সাধন-ভজন পদ্ধতি, দেহতত্ত্বের গান গ্রাম বাংলার সকল সম্প্রদায়ের নিজস্ব সম্পদ। বাউল গান আজও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সব বাঙালির মনেই আলোড়ন সৃষ্টি করে। এমনকি তাবিজ-কবজ তন্ত্রে-মন্ত্রেও বাঙালির বিশ্বাস আছে। বিয়ের আচার-অনুষ্ঠানে গান বাজনা, গায়ে হলুদ উভয় সম্প্রদায়ের প্রচলিত রীতি। এ সবই আন্ত:সম্প্রদায় সমন্বয়বাদ এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মহান ঐতিহ্য ।[৩১]

সাম্প্রদায়িকতার বিকাশ

ভারত তথা বাংলায় ব্রিটিশ শাসনের ১৯০ বছর ছিল অত্যন্ত ঘটনাবহুল ও তাৎপর্যপূর্ণ। সমাজ-জীবন, রাজনীতি, অর্থনীতি, যোগাযোগ ব্যবস্থা সর্বত্রই ঘটেছিল পরিবর্তন। পরিবর্তন ঘটে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের। ১৭৯৩ সালে ব্রিটিশ কর্তৃক প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত একদিকে হিন্দু জমিদার-মহাজন, অন্যদিকে মুসলমান প্রজা সাধারণের উপর জমিদার মহাজনদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণ ও বৈষম্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। এছাড়া প্রাদেশিক পরিষদ বা আইন সভার আসন বন্টন নিয়েও হিন্দু মুসলিম দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।[৩২]

১৯০৭ সালে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা ছিল বঙ্গভঙ্গের রাজনৈতিক স্রোতধারার সৃষ্টি। বাংলার সাম্প্রদায়িকতা ছিল হিন্দু জমিদার এবং তাদের মুসলমান প্রজাদের মধ্যে ভূ-সংক্রান্ত উত্তেজনার ফসল। বঙ্গভঙ্গের পর যে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল তার বিশ্লেষণ থেকে এ ধারণা সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। তবে ভূ-সম্পর্কের চেয়ে বঙ্গভঙ্গের দ্বারা উজ্জীবিত এলিট গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতাই বরং সাম্প্রদায়িকতা উদ্ভবের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে উদয় হয়েছিল।[৩৩] বঙ্গবিভাগ বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন সাধন করেছে। বাংলার রাজনীতি এ সময়ে আর উনিশ শতকের রাজনীতির ধারায় প্রবাহিত নয়। বঙ্গভঙ্গের ফলে উদ্ভূত রাজনৈতিক ইস্যুগুলো মুসলমানদের মধ্যে নতুন জাতীয় চেতনার সৃষ্টি করে। এই চেতনায় মুসলমান নেতৃত্ব গোটা রাজনৈতিক সম্পর্কে নতুনভাবে মূল্যায়ন করে। এই মূল্যায়নে মুসলমানদের প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী ও বিরোধী শক্তি হচ্ছে হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণি, বৃটিশ রাজশক্তি নয়। বৃটিশ কর্তৃক বাংলা দখলের পর অবনত মুসলমান অভিজাত শ্রেণি ব্রিটিশদের শত্রু হিসেবে গণ্য করেছে। কিন্তু বিশ শতকের শুরুতে পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মুসলমান নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ রাজের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করে। পরিবর্তিত এ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মুসলমানদের প্রতিদ্বন্দ্বী হলো হিন্দু ভদ্রলোক।[৩৪]

১৯২৮ সালের নেহেরু রিপোর্ট, ১৯২৯ সালে জিন্নাহর চৌদ্দ দফা এবং ১৯৩২ সালে ব্রিটিশ সরকারের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ হিন্দু মুসলিম সম্পর্কের অবনতি ঘটায়। এর পরিণতিতে

মুসলিম লীগ নেতা জিন্নাহর হিন্দু মুসলিম দু'টি পৃথক জাতি এ ধারণা দ্বি-জাতিতত্ত্বের জন্ম দেয়।[৩৫] ১৯৩২ সালের ১৭ আগস্ট ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড সরকারের সাময়িক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। সাংবিধানিক সংস্কারের নতুন পরিকল্পনাধীনে প্রদেশগুলোতে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে কী ধরনের ও কতখানি প্রতিনিধিত্ব প্রদান করা হবে, সে সংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহ এ সিদ্ধান্তে প্রকাশ করেন। এ সকল প্রস্তাবসমূহকে সাধারণভাবে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ (Communal Award) বলা হয়।[৩৬] বাংলা প্রদেশের জন্য প্রস্তাবিত ২৫০টি আসন নিম্নরূপে বিভক্ত করা হয়।

সারণী ১: বাংলায় সম্প্রদায়গত রোয়েদাদ[৩৭]

নির্বাচনী এলাকা	আসন সংখ্যা
মুসলমান	১১৭
মুসলিম মহিলা	০২
সাধারণ	৭০
অনুন্নত শ্রেণি	১০
সাধারণ মহিলা	০২
ইউরোপীয়	১১
ইউরোপীয় ব্যবসায়ী	১৪
ভারতীয় ব্যবসায়ী	০৫
জমিদার	০৫
বিশ্ববিদ্যালয়	০২
শ্রমিক	০৮
এ্যাংলো ইন্ডিয়ান	০৩
এ্যাংলো ইন্ডিয়ান মহিলা	০১

সম্প্রদায়গত রোয়েদাদ নৈতিকতা ও ব্যক্তি স্বার্থের ধারাবাহিকতার প্রতিফলন। কেন্দ্র ও প্রদেশগুলোর আইন প্রণেতাগণকে বিভিন্ন সম্প্রদায় স্বার্থের মধ্যে বিভক্ত করা হয়। মুসলমান, অনুন্নত সম্প্রদায়, শিখ, ইউরোপীয় এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের সাধারণ জনগণসহ জমিদারদের বিশেষ নির্বাচনী এলাকা, শ্রমিক, মহিলা ও সম্মানীত ব্যক্তিবর্গ ছিল এই বিশেষ সম্প্রদায় ও স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট। ১৯৩১ সালের আদমশুমারিতে বাংলার মোট জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ২৭.৮ মিলিয়ন অথাৎ ৫৪%। আর ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমান ছিল মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশের বেশি। অথচ রোয়েদাদে মুসলমানদের দেয়া হয় ১১৯টি আসন। যা আইন সভার মোট আসনের ৪৭.৮%। বাংলার গভর্নর জেটল্যান্ড সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ সম্পর্কে বলেন- এই রোয়েদাদ ক্রমাগতভাবে সাম্প্রদায়িক তিক্ততা বাড়িয়ে দেবে।[৩৮] ১৯৩৩ সালে মুসলিম লীগের গৃহীত প্রস্তাবে রোয়েদাদ সম্পর্কে বলা হয়- 'যদিও এই সিদ্ধান্তে মুসলমানদের অনেক দাবিই অপূর্ণ থেকে যায়, তথাপি দেশের বৃহত্তম স্বার্থে মুসলমানগণ তা গ্রহণ করেন। অবশ্য মুসলমানগণ তাদের সকল দাবি মেনে নেয়ার জন্য চাপ দিয়ে যাওয়ার অধিকার নিজেদের হাতে রাখেন।" মুসলমানগণ তাদের জনসংখ্যার অনুপাতে বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশের আইন পরিষদে বিধিবদ্ধ নিরঙ্কুশ

সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু রোয়েদাদে তাদের এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা হয়নি।[৩৯]

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে কংগ্রেস ভাল ফলাফল করলেও মুসলিম লীগ খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি। তবে সামগ্রিকভাবে মুসলিম লীগ মোট মুসলিম আসনের ২৬.৫২% অর্জন করে মুসলীম লীগকে একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।[৪০] ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর কংগ্রেস কর্তৃক মুসলিম লীগের সাথে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠনের দাবি অস্বীকৃতির ফলে একটি ঐক্যবদ্ধ ভারত গঠনের সকল সুযোগ নষ্ট হয় এবং বাস্তবে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক পন্থায় ভারতের বিভক্তি অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। স্যার সৈয়দ আহমদ খান তার পাইওনিয়ার ও তাহজিব- আল- আখলাক পত্রিকার মাধ্যমে প্রচার করতে থাকেন যে, ভারতের হিন্দু ও মুসলমান দুটি পৃথক জাতি। ভারতীয় কিছু হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতা এবং কংগ্রেসের কিছু কর্মকাণ্ড মুসলমানদের ভারতে আলাদা জাতি হিসেবে ভাবতে বাধ্য করে। যেমন পাঞ্জাবে স্বামী দয়ানন্দের 'আর্য সমাজ আন্দোলন' ধর্মান্তরিত মুসলমান ও খিস্টানদের শুদ্ধিকরণের দ্বারা হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনা। স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের সময় চরমপন্থী নেতারা হিন্দু ধর্মের প্রতীকগুলো আন্দোলনে ব্যবহার করে। কালী মূর্তির সামনে প্রতিজ্ঞা করা, ধর্মগ্রন্থ গীতা স্পর্শ করে শপথ গ্রহণ করা প্রভৃতি হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠানাবলী মুসলমানদের স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন হতে দূরে সরিয়ে রাখে।[৪১] ১৯৪০ সালে ২৩ মার্চ লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হলে উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতার চূড়ান্ত বিকাশ লক্ষ করা যায়। এর পর মুসলীম লীগ মুসলমানদের আলাদা রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হয়। ১৯৪৬ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ব্রিটিশ সরকার ভারতে মন্ত্রিমিশন নামে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস গ্রহণ করলেও অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দেয়াকে কেন্দ্র করে উভয় দলের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগ মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা বাতিল করে দেয় এবং ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস (Direct Action Day) পালনের আহবান জানায়। মুসলিম লীগের এ রাজনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা। এ মন্ত্রিসভা ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করে। এ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে কলকাতায় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। এই দাঙ্গা কুখ্যাত কলকাতা হত্যাযজ্ঞ বা The Great Calcutta Killing নামে পরিচিত। এ দাঙ্গায় এদিনে কমপক্ষে পাঁচ হাজার লোক নিহত হয়।[৪২] এ দাঙ্গার কারণে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ভারত বিভাগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

বাংলা তথা ভারতে দীর্ঘদিন ধরে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির মাধ্যমে বসবাস করলেও ব্রিটিশ শাসনের ফলে তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশ ঘটে। বাংলায় নতুন করে অসম্প্রদায়িক চেতনাবোধ জাগ্রত করতে হবে। আর এর জন্য যে রাজনৈতিক মতাদর্শগত সাংস্কৃতিক বিপুল আয়োজন দরকার তার কতটুকু আমরা করতে পেরেছি? সেই প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উপলব্ধিই বা আমাদের মধ্যে কতটুকু আছে?[৪৩]

পরিশেষে বলা যায় যে, সাম্প্রদায়িকতা ভারতীয় উপমহাদেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা। প্রাচীনকাল থেকে বাংলায় একটি অসাম্প্রদয়িক চেতনার রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হলেও ব্রিটিশ শাসনের মাঝামাঝিতে ব্রিটিশদের ভাগ করো ও শাসন করো নীতির প্রেক্ষিতে এখানে সাম্প্রদায়িকতার সূচনা হয়। পরবর্তীতে বাংলার হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ন রাখার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। তারপরও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভারতীয় উপমহাদেশকে অশান্ত করে তোলে । এর ফলে ব্রিটিশ সরকার লাহোর প্রস্তাব ও দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে ধর্মকে কেন্দ্র করে উপমহাদেশকে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে বিভক্ত করে।

তথ্যসূচি:

---

১ A Strong sense of belonging to a particular, especially religious community, which can lead to extreme behavior or violence towards other. *Oxford Learners Dictionary*.

২. বদরুদ্দীন উমর, *সাম্পদায়িকতা ও রাজনৈতিক অগ্রগতি*, (কলকাতা: ১৯৭১), পৃ. ২

৩. Akbar M.J, Neheru, *The making of India*, (London: Penguin books, 1989), (Wikipedia).

৪. জন, আর ম্যাকলেন, "বঙ্গবিভাগ (১৯০৫): হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক" সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)*, ১ম খণ্ড, (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯২) পৃ. ৩২৫

৫. বদরুদ্দীন উমর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২

৬. জয়া চ্যাটার্জি (অনুবাদ আবু জাফর), *বাঙলা ভাগ হল হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশ বিভাগ* ১৯৩২-১৯৪৭, (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৩), পৃ. ১৭৮

৭. গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, (ঢাকা: অবসর প্রকাশন, ২০১২), পৃ. ১৯৭

৮. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালির ইতিহাস (আদিপর্ব)*, (কলকাতা: দে'জ পাবলিশার্স, ১৪০২ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৪৭৮-৪৭৯

৯. গোলাম মুরশিদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২-৫৩

১০. ড. অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, (কলকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সি, ২০০২), পৃ. ৩ (ড. পঞ্চানন সাহা, *হিন্দু-মুসরিম সম্পর্ক; নতুন ভাবনা*, (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০১), পৃ. ২০)

১১. গোলাম মুরশিদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯

১২. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলা পিডিয়া*, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ১৫০

১৩. Jagdish Narayan Sarkar, *Hindu-Muslijm Relations in Bengal, (Medical period)*, (New Delhi, 1985), p. 26.

১৪. ড. অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪

১৫. ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪

১৬. শৈলেন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *দাঙ্গার ইতিহাস*, (কলকাতা: মিত্র এন্ড ঘোষ পাবলিকেশন্স, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ), পৃ. ২৮৩

১৭. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলা পিডিয়া*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫০

১৮. K.M.Mohsin, *Muslim Conquest: Bengal Sultanate Society and culture,* A .F. Salahuddin Ahmed and Bazlul Mobin Chowdhury (ed) *Bangladesh National Culture and Heritage*, Dhaka, 2004, pp.100-101

১৯. ড. হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশের রাজনীতি, সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন (১৭৫৭-২০০০)*,(ঢাকা: নিউ এইজ পাবলিকেশন্স,২০০৭), পৃ. ৫২

২০. ড. মো: মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস(১৯০৫-১৯৪৭)*, (ঢাকা: তাম্রলিপি প্রকাশনী, ২০০৮), পৃ. ৮০-৮১
(আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, Leela Visaria and Pravin Visaria, Population (1757-1947) in Dharma Kumar and Tapan Ray chaudhuri (ed) *The Cambridge Economic History of India*, vol-2, c1757 –c1970,(Delhi: Orient Longman,1984), pp. 463-532)

২১. মো: মুসলেহ উদ্দিন সিকদার, *সাম্প্রদায়িক রাজনীতি: প্রেক্ষিত বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫-১৯৪৭)*, ড. নুরুল হুদা আবুল মনসুর (সম্পাদিত), *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, সংখ্যা-২৯-৩০, (ঢাকা: ২০০৮), পৃ. ৪০

২২. গোলাম মুরশিদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৭

২৩. মুনতাসির মামুন ও মাহবুবর রহমান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, (ঢাকা: সুবর্ণ বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স, ২০১৩), পৃ. ৪৩

২৪. ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৪ (বিস্তারিত তথ্যের জন্য - ড. পঞ্চানন সাহা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩-৩৪)

২৫. গোলাম মুরশিদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৭

২৬. জন, আর ম্যাকলেন, " বঙ্গবিভাগ (১৯০৫): হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক" সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)*, ১ম খণ্ড, (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯২), পৃ. ৩২৯

২৭. P. Spear, *India, Pakistan and West,* (London: Oxford University Press, 1949), p. 191

২৮. ড. মো: মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫

২৯. জন, আর ম্যাকলেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৪
(বিস্তারিত তথ্যের জন্য - Mohammad Shah, *The British Divided and Rule Policy as a Factor of Muslim Separatism in Bengal*, Dr. Nurul huda Abul Mansur (Edited), *Bangladesh Historical Studies*, Vol-20, Dhaka; 2008, p. 75)

৩০. মোঃ মুসলেহ উদ্দিন সিকদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮-৪৯

৩১. অজয় রায়, *বাংলা ও বাঙালি*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৭৭), পৃ. ৪৭

৩২. ড. হারুন-অর-রশিদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪

৩৩. জন, আর ম্যাকলেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৫-৩২৬

৩৪. জে, এইচ. বামফিল্ড, *রাজনীতির সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি*, ১৯০৬-১৯৪৭, সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)*, ১ম খণ্ড, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯২, পৃ. ৩৬৬

৩৫. অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫*, (ঢাকা: বাংলাদেশ বুক কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি:, ২০১২), পৃ. ১৬

৩৬. বিপুল রঞ্জন নাথ, *বাংলাদেশের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিকাশ*, (ঢাকা: বুক সোসাইটি, ১৯৯৬),পৃ. ৪০

৩৭. জয়া চ্যাটার্জি (অনুবাদ আবু জাফর), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫

৩৮. জয়া চ্যাটার্জি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪-২৬

৩৯. বিপুল রঞ্জন নাথ, *প্রাগুক্ত* পৃ. ৪১

৪০. M.B.Nair, *Politics in Bangladesh: A study of Awami League 1949 – 1958,* (New Delhi: 1990), p. 26

৪১. ড. মোঃ মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২

৪২. জয়া চ্যাটার্জি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭১ (বিস্তারিত তথ্যের জন্য - ড. মো: মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত* পৃ. ১৩৫-১৩৬)

৪৩. হায়দার আকবর খান রনো, "সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় জঙ্গিবাদ ও ক্রসফায়ার", *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৭ জুন, ২০১৬, পৃ. ১০।